সত্যকথন ২

লেখকবৃন্দ

আসিফ আদনান, ড. সাইফুর রহমান, তানভীর আহমেদ, ডা. রাফান আহমেদ
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার
মিসবাহ মাহীন, জাকারিয়া মাসুদ, আশিক আরমান নিলয়, আসিফ মাহমুদ
মুহাম্মাদ মশিউর রহমান, মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

শারয়ী সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

ক্যামেরা ১১
তানভীর আহমেদ

নাস্তিকদের সব অভিযোগের জবাব দিন মাত্র দুই বাক্যে! ১৫
আসিফ মাহমুদ

কেন ও কীভাবে ২০
মুহাম্মাদ মশিউর রহমান

ইসলামোফোবিয়া ২৪
ডা. রাফান আহমেদ

প্রমাণ দাও ২৮
আসিফ মাহমুদ

ডারউইনিজম নিয়ে কিছু কথা... ..... ৩৩
ড. সাইফুর রহমান

ইলিয়াড, ট্রয় ও নিরীশ্বরবাদ ৪০
আশিক আরমান নিলয়

'নারীবাদ' নারীকে বাদ দিয়েই নতুন কোনো চিন্তা নয় তো? ৪৮
মিসবাহ মাহীন

নাস্তিকতা, তর্ক, যুক্তি ৬১
আসিফ আদনান

সমকামিতা কি আসলেই জেনেটিক? ৬৭
ড. সাইফুর রহমান

কওমে লূত ২.০ : একটি ব্যবচ্ছেদ ৭০
মুহাম্মাদ মশিউর রহমান

ইসলাম ও নারীবাদ ৭৯
তানভীর আহমেদ

ইসলামে কি নারীমাত্রই অশুভ বা অমঙ্গলের প্রতীক? ৯০
মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

হাদীসে কি নারীদেরকে ভোগ্যপণ্য বলা হয়েছে? ১০৪
মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

সাত হারফ কি কুরআনের একাধিক ভার্সন? ১১২
মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মপালন ও উপাসনালয়ের অধিকার ১২৪
মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বোরাকে করে আসমানে গমন করেছিলেন? ১৩৬
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

একটি শ্বেতসারীয় উপাখ্যান ১৪৫
মুহাম্মাদ মশিউর রহমান

ইসলামি সভ্যতা কেন সর্বশ্রেষ্ঠ? ১৫৪
আসিফ আদনান

ভূমিকা

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর। দরুদ ও সালাম নবি করিম ﷺ-এর ওপর, যাকে সত্যসহ প্রেরণ করা হয়েছিল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।

একজন আলিম বলেছিলেন, 'একসময় মুশরিকরা idol (মূর্তি) পূজা করত। এখনকার মুশরিকরা ideology (মতাদর্শ) পূজা করে।' এছাড়া ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে 'ধর্মান্তর বা conversion' এর ধারণাটা সেভাবে নেই। আর যেকোনো এলাকার নাস্তিকরাই সংগঠিত হতে পারলে ওই এলাকার প্রভাবশালী ধর্মটাকে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ করতে শুরু করে। আর যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পায়, সেখানে রক্তের বন্যায় ধর্ম ও ধার্মিকদের ভাসিয়ে দেয়। অতীতে সোভিয়েত রাশিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে তারা এর সাক্ষর রেখেছে। মজার ব্যাপার হলো, তারা মুসলিমদের হীনম্যতায় ফেলার জন্য শক্তিশালী অর্থনীতি কিংবা কম অপরাধের দেশগুলোকে দেখিয়ে বলে, 'ঐ দেখো, "নাস্তিক" দেশগুলো কত ভালো! মুসলিম দেশগুলো খুব খারাপ...।' ওদিকে 'নাস্তিক' দেশগুলো থেকে গণহত্যার উদাহরণ দেখালে তারা বলে, 'এর দায় নাস্তিকতার না, এর দায় অমুক মতাদর্শের!' এই হচ্ছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ ও ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের এক ঝলক।

বাংলাদেশে ইসলামের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণটা নাস্তিকদের মাধ্যমে অনেকদিন ধরেই হচ্ছে; যদিও এর বেশিরভাগ (কু)বুদ্ধিই খ্রিষ্টান মিশনারিদের থেকে অনুবাদ করে পাওয়া। মুসলিমরাও এগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ করেছে, তবে সেগুলো সুসংগঠিত না। ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানোছিটানো। তাই যে অভিযোগ করা হয়—'মোমিনরা কলমের বিরুদ্ধে কলম চালাতে জানে না, শুধু ভায়োলেন্স করে'—তা আসলে ভুল। মুমিনগণ বহু আগে থেকেই কলম, কীবোর্ড, কীপ্যাড, কণ্ঠ ইত্যাদি চালাচ্ছেন। আপনি দেখতে না পারলে বা দেখতে না চাইলে সেটা আপনার ব্যর্থতা।

ছড়ানোছিটানো জিনিস মলাটবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো আগের চাইতে কিছুটা হলেও গোছানো, সুসংগঠিত ও সুসংরক্ষিত হওয়া। এবং জনগণ এটা খুব করে চাইছিলও। তাই নাস্তিকতাবিরোধী বই লেখার ধারাটা শুরু হওয়ার পরপরই তা আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যাপক সাড়া ফেলে। আমাদের 'সত্যকথন' ফেসবুক পেইজের যাত্রা শুরু হয় ২০১৬ সালের নভেম্বরে। নাস্তিক-অজ্ঞেয়বাদী-সেক্যুলার কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের প্রত্যুত্তর ও ব্যবচ্ছেদ নিয়ে বাংলাদেশের বহু উদীয়মান ইসলামি লেখকের লেখাগুলো একে একে প্রকাশ হতে থাকে এই পেইজে। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে সত্যকথনের বাছাইকৃত লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় আমাদের প্রথম বই 'সত্যকথন'। এরই ধাবাহিকতায় আমাদের 'সত্যকথন' সিরিজের ২য় বই 'সত্যকথন ২'।

অমুসলিমরা একটার পর একটা আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করেই যাবে, আর মুসলিমরা সেগুলোর রক্ষণাত্মক জবাব দিয়েই যাবে—এটা দাওয়াহর আদর্শ পদ্ধতি নয়। যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা একের-পর-এক প্রশ্ন আনতেই থাকবে। এগুলোর প্রত্যুত্তরে বই লিখতে থাকলে বইয়ের লাইব্রেরি হয়ে যাবে, কিন্তু বিদ্বেষীদের প্রশ্ন তখনও শেষ হবে না। আর মানবীয় যুক্তিবুদ্ধি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। আস্তিক-নাস্তিক যে পক্ষের কথাই বলুন-না-কেন, দিনশেষে উভয়পক্ষের আর্গুমেন্ট-ই মানবীয় খণ্ডিত জ্ঞানের ভেতর সীমাবদ্ধ।

ইসলামের কিছু বিধান এমন আছে, যেগুলো অমুসলিম তো দূরের কথা, মুসলিমদের কুপ্রবৃত্তিই মানতে চাইবে না। এমনকি কিছু হুকুমের ব্যাপারে আল্লাহ তো জানিয়েই দিয়েছেন যে, এগুলো আমাদের অপছন্দ হবে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে সেগুলো পালন করতে হবে। 'আজকে এগুলো অমুসলিমদেরকে পছন্দ করিয়েই ছাড়ব'—এমন মনোভাব নিয়ে যদি কেউ নাস্তিকদের সাথে তর্ক শুরু করেন, তাহলে প্রবল সম্ভাবনা আছে যে, তার্কিক সাহেব আল্লাহর দ্বীনকেই বিকৃত করে ছাড়বেন। আবার কিছু বিধান আছে যেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখানো ছাড়া কখনোই সেগুলোর সুফল বোঝা যাবে না। যেমন—ইসলামি অর্থনীতি বা বিচারনীতি বাস্তবে প্রয়োগ না করে শুধু এর পক্ষে বইয়ের পর বই লিখে যাওয়াটা পূর্ণাঙ্গ সমাধান না।

তাই আল্লাহর হুকুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কী জীবনের প্রায় পুরোটা সময় ইসলামের মৌলিক জিনিসগুলোর দাওয়াহ আগে দিয়েছেন। শিরক-কুফরের মৌলিক বিষয়গুলোকে ধরে ধরে আক্রমণ করেছেন। শিরকি-কুফরি ধারণাগুলো যে কত অসার, কাফির-মুশরিকদের জীবন যে কত অন্ধকার, সেগুলো ধরে ধরে দেখিয়েছেন। ইসলামবিরোধী শক্তি এতে এমনই টালমাটাল হয়ে গেছে যে, 'ইসলামের এটা এমন কেন?' 'ওটা অমন না কেন?'-এসব প্রশ্ন তোলারই সুযোগ পায়নি; সুযোগ পেলেও হালে পানি পায়নি।

সাহাবিদের কয়েক প্রজন্ম পরই মুসলিমরা গ্রীক দর্শনের সাথে পরিচিত হয়। উম্মাহর বড় একটা অংশের তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ইসলামকে দুমড়ে-মুচড়ে দর্শনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কিছু ভ্রান্ত ফিরকার উদ্ভব হয়। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর আলিমগণ দর্শনের বিপরীতে অবিকৃত ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখেন। আর কেউ কেউ দর্শনকে এমন আক্রমণ করে এর অসারতা তুলে ধরেন যে, যাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, তাদের অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে।

আজকে পশ্চিমা উদারনৈতিক বস্তুবাদী দর্শনগুলো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। নিজেকে সেরা মনে করে তারা ইসলামকে আক্রমণ করছে। ইসলাম কেন ওদের মনমতো হলো না—এসব জানতে চাইছে। এটা ওই মক্কা আর গ্রীসের মুশরিকদের পুরোনো কলাকৌশলের-ই নতুন রূপ। ওই একই পদ্ধতিতেই এর মোকাবিলা করতে হবে। 'সত্যকথন' সিরিজের প্রথম বইটির মতো এই বইতেও প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকার চক্রটা থেকে বের হয়ে পালটা প্রশ্ন করার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে।

শিয়া সম্প্রদায় সাহাবিদেরকে (রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন) গালিগালাজ করে, কাদিয়ানিরা গোলাম আহমদ (লা'নাতুল্লাহ আলাইহি)-কে নবি মানে, কুরআনিস্টরা হাদীস অস্বীকার করে। দূর থেকে দেখে আমাদের কাছে মনে হয় তাদের যুক্তিগুলো আমরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারব। কিন্তু বাস্তবে কোনো শিয়া, কাদিয়ানি বা কুরআনিস্টের সাথে তর্ক করে দেখেন, অত সহজ না। আলিম বা ইসলামের ছাত্র না হলে তাদের কিছু কুযুক্তি শুনে রীতিমতো ভড়কে যাবেন। তেমনি নাস্তিকদের সব কুযুক্তিও মজায় মজায় গল্পে গল্পে খণ্ডন করা সম্ভব না। আপনি সেসব কুযুক্তিতে কান না দিয়ে নিজের ইবাদাত-বন্দেগি নিয়ে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু নাস্তিকদের কঠিন কঠিন যুক্তিগুলো কেউ আগ্রহ ভরে শুনবে, তারপর আশা করবে শরবতের মতো সহজ করে সেগুলোর উত্তর তাকে গিলিয়ে দেয়া হোক—এটা সম্ভব না। কঠিন প্রশ্নের উত্তর কঠিন হতেই পারে। 'সত্যকথন ২'-এ কিছু কাঠখোট্টা লেখা থাকতে পারে। এরচেয়েও অনেক কঠিন কঠিন আক্রমণ নাস্তিকদের আছে। আল্লাহর কোনো-না-কোনো বান্দা সেগুলোরও সমমানের কাঠখোট্টা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। না পড়তে চাইলে নেই। কিন্তু পড়তে গিয়ে আমরা যেন 'ধুর কীসব লেখসে, কঠিন কথা বুঝি না!' বলে বই ছুঁড়ে না ফেলি।

আলিম ও তালিবুল ইলম সমাজের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে 'সত্যকথন' এর উদ্যোগের জন্য দুআ করার। বিভিন্ন সেক্টরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই তো ইসলামের খেদমত হবে। 'সত্যকথন ২' এর লেখকেরা শারয়ী সম্পাদনার জন্য আপনাদেরই মুখাপেক্ষী। আপনারা ইমামতি না করলে এরা সালাতও পড়তে পারবে না, এরা মারা গেলে জানাযাটাও আপনারাই পড়াবেন।

'সত্যকথন' পেইজ এবং এর প্রকাশিত বইয়ের উদ্যেশ্য হলো নাস্তিক-অজ্ঞেয়বাদী-সেক্যুলার কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের প্রত্যুত্তর ও ব্যবচ্ছেদ। ইসলামের দাওয়াহকে সবার কাছে পৌঁছে দেয়া। 'সত্যকথন' ফেসবুক পেইজে নিয়মিতই এ ব্যাপারে লেখা পোস্ট হচ্ছে। এই বই প্রকাশ হওয়া ('সত্যকথন ২' ১ম সংস্করণ) পর্যন্ত পেইজ থেকে প্রায় ৫০০ পর্বের লেখা পোস্ট হয়েছে। প্রতিবার পর্বের শতক পূর্ণ হলে সকল লেখার তালিকা ও লিংক এবং পিডিএফ সংকলন প্রকাশ করে পোস্ট দেওয়া হয়। পেইজের পিনপোস্টে গেলে সেটি পেয়ে যাবেন। 'সত্যকথন' শুধু বই আকারেই না, বরং সব সময়েই আপনাদের সঙ্গে আছে এবং কাজ করে যাবে ইন-শা-আল্লাহ। আপনাদের সবার অংশগ্রহণ এবং দুআ কাম্য।

আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা। ওয়ালহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

সত্যকথন টিম

ফেসবুক পেইজ : www.facebook.com/shottokothon1

ওয়েবসাইট : www.response-to-anti-islam.com
www.rafanofficial.wordpress.com

ক্যামেরা

তানভীর আহমেদ

ক্যানন, নিকন আর সনি এর মতো সুবিশাল কোম্পানিগুলো নিজেদের ক্যামেরার অটোফোকাস সেন্সর সবসময় উন্নত করার চেষ্টায় রত থাকে। নিরলস চেষ্টা, লক্ষ মাপামাপি, প্রোগ্রামিং আর কোটি কোটি ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মধ্য দিয়ে ক্যামেরাগুলোর অটোফোকাস সেন্সর অনেক উন্নত আর দারুণ হয়ে উঠেছে।

আগেকার কিছু ক্যামেরায় ফোকাস করতে 'Sonar' এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার হতো। একটা শব্দ যেয়ে ফিরে আসলে সেখান থেকে ফোকাস করা বস্তুটি কতদূরে রয়েছে তা ধারণা করে লেন্সের ফোকাল লেংথ বাড়িয়ে-কমিয়ে ফোকাস করা হতো। এরও আগে পেশাদার ক্যামেরাম্যানদের একজন সাহায্যকারী দরকার হতো, যে কি না দড়ি দিয়ে ক্যামেরা আর ফোকাস করা বস্তুর দূরত্ব মেপে ক্যামেরাম্যানকে জানাত! আর এরপর ক্যামেরাম্যান হিসেব কষে ফোকাস করতেন। এখনকার আধুনিক ক্যামেরাগুলো কনট্রাস্ট, শার্পনেস ইত্যাদি মাপামাপি করে নিখুঁত প্রোগ্রাম করা সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফোকাস করে থাকে।

কিন্তু এখনো সবচেয়ে অতাধুনিক ক্যামেরার অটোফোকাস কীভাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে টিউটোরিয়াল ভিডিয়ো আসে। কোনো ক্যামেরার টাচস্ক্রিনে ফোকাস এরিয়াতে স্পর্শ করলেই হয় তো কোনো ক্যামেয়ায় ছবি তোলার আগ মুহূর্তে বাটন দিয়ে ফোকাস এরিয়া নির্ধারণ করে দেয়া লাগে। সাধারণত ছবির কোণায় থাকা বস্তু এত কসরত করে ফোকাস করা হয়।

অথচ চোখ ফোকাসিং করে আসছে শতসহস্র বছর ধরে। অন্যসব প্রাণীর চোখ বাদ দিলাম, মানুষের চোখও প্রায় ইনস্ট্যান্ট ফোকাস করে থাকে (সেকেন্ডের ৩ ভাগের ১ ভাগ সময়ে)। এই মুহূর্তে স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকা মানুষটি স্ক্রিনের পেছনে তাকালে

সাথে সাথে ফোকাস হয়ে যায়। আবার ফিরে তাকালে আবারও এখানে ফোকাস। এছাড়াও ক্যামেরার লেন্সগুলো হয় ঢাউস আকৃতির আর সেখানে কাঁচ সামনে-পেছনে করে ফোকাস করতে হয়। অথচ চোখের ফোকাসিং কি না হয় লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে!

শুধু মানুষের চোখের মতো এত জটিল, এত উন্নত ফোকাসিং যে বিলিয়ন বছরের বিবর্তনেও সম্ভব না, বরং একজন Intelligent Designer বা বুদ্ধিমান নকশাকারীরই তৈরি করা সেটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এই তো গেল কেবল মানুষের চোখের কথা; ঈগলের চোখ তো মাইল দূর থেকেও ছোট জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়। একটা তুলনায় দেখা গিয়েছে, মানুষের এমন চোখ থাকলে দশ তলা সমান বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে ছোট পিঁপড়ে স্পষ্ট দেখতে পেত।

চোখের ব্যাপার নিয়ে ডারউইনও লিখতে বাধ্য হয়েছিল। On the origins of Species এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে সে লিখেছে—

> 'To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree.'

অর্থাৎ সহজভাষায়—চোখের ফোকাসিং, আলোক নিয়ন্ত্রণ এতসবকিছুর কার্যকলাপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার মতো বিষয়টি, স্বীকার করতেই হয়, ন্যাচারাল সিলেকশানের নামে চালিয়ে দেয়া সবচেয়ে অযৌক্তিক বলে মনে হয়।

ডারউইন সত্যের কোনো দলিল নয়। দলিল নয় কোনো থিউরি বা বক্তব্যও। ডারউইনের এই বক্তব্যটুকু অনেকেই সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। অথচ এই বিষয়ে সে অতটুকু বলেই থেমে যায়নি। বরং লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের অসম্ভবকে সম্ভব করার অবৈজ্ঞানিক ফিরিস্তি।[১]

---

[১] To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the Focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree. When it was first said that the sun stood still and the world turned round, the common sense of mankind declared the doctrine false; but the old saying of Vox populi, vox Dei, as every philosopher knows, cannot be trusted in science. Reason tells me, that if numerous gradations from a simple and imperfect eye to one complex and perfect can be shown to exist, each grade being useful to its possessor, as is certainly the case; if further, the eye ever varies and the variations be inherited, as is likewise certainly the case; and if such variations should be useful to any animal under changing conditions of life, then the difficulty of

কিছু বিবর্তনবাদী মানুষের চোখ কি 'নিখুঁত' সেই প্রশ্ন করে চলে যায় অন্যদিকে। ঈগলের চোখ বা অক্টোপাসের চোখ আরও বেশি কর্মক্ষম, নিখুঁত সেসব বর্ণনা দিয়ে তারা জাহির করে বেড়ায় যে, মানুষের চোখ মোটেও 'নিখুঁত' বা 'উন্নত' নয়। ভাষার মারপ্যাঁচ ব্যবহার করে আলোচনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা যেন তাদের রক্তে মিশে আছে।

মানুষের চোখ নিখুঁত এই দাবি কেউ করেনি। বরং চোখে আলো প্রবেশ করা, সেগুলো রেটিনায় উলটো প্রতিবিম্ব তৈরি করা, সেই প্রতিবিম্ব আবার নিউরন কর্তৃক মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়া, মস্তিষ্কে পৌঁছে উলটো প্রতিবিম্ব আবার সোজা হয়ে গিয়ে শেষমেশ দেখার অনুভূতি তৈরি করা—এত এত ব্যাপার স্যাপার, এত কারসাজি যে প্রয়োজনানুযায়ী সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এতসব প্রক্রিয়া এত সুন্দর করে হওয়ার মেকানিজমের কথা।

'মানুষের চোখ নিখুঁত না, এর থেকেও উন্নত চোখ প্রাণিকূলে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত আর নিখুঁত চোখ অক্টোপাসের চোখ; সুতরাং এসব চোখের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, এগুলো একা একাই বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন মানের হয়েছে'—এসব কথাবার্তা এই কথাগুলোর মতোই অসার—ক্যানন ৭০ডি ক্যামেরা নিখুঁত ক্যামেরা নয়, এর থেকেও উন্নত ক্যানন ৮০ডি, ১০০ডি ইত্যাদি রয়েছে। সুতরাং কোনো ক্যামেরারই কোনো তৈরিকারী, নির্মাণকারী নেই!

'মানুষ নিখুঁত সৃষ্টি না'—এই দাবির পেছনে আরেকটা বার্তা থাকে। আর সেটা হলো, অতএব মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত না। অথচ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' তার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেকটি ফিচারের জন্য করা হয়নি; বরং সমস্তটা মিলে যে মানুষ, সেই মানুষকে সকল সৃষ্টির সেরা বলা হয়েছে। মানুষ তার মেধা, বুদ্ধি, দর্শন সবকিছু দিয়ে অন্যসবকিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে সে কারণে বলা হয়েছে। কিন্তু ডকিন্সরা লেকচারে আর জাফর ইকবালরা সায়েন্স ফিকশনগুলোতে যখন

---

believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, should not be considered as subversive of the theory. How a nerve comes to be sensitive to light, hardly concerns us more than how life itself originated; but I may remark that, as some of the lowest organisms, in which nerves cannot be detected, are capable of perceiving light, it does not seem impossible that certain sensitive elements in their sarcode should become aggregated and developed into nerves, endowed with this special sensibility. - On the origins of Species, Chapter 6. এখানে ডারউইন প্রথমে—চোখের এমন কুশলী প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তনে হওয়া সম্ভব না বলে মনে হয়—বলে স্বীকার করে। কিন্তু তারপর তা মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা বলে চালিয়ে দিল। বলল, এখন না কি আমরা চিন্তা করতে পারছি না। 'এমনি এমনিই হয়ে গেছে' এমন রূপকথায় আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে বলল। কীভাবে হয়েছে তা বিজ্ঞান একসময় ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু কেন হয়েছে সেটা? কেন এমনই হলো সেটার উত্তর বিজ্ঞান কখনো বলে না। 'কেন' এর উত্তর সবসময় 'এমনিতেই হয়েছে আর কী!'

বিবর্তনের সাফাই গেয়ে মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়ে(!) এখনো পুরোপুরি নিখুঁত হয়ে উঠেনি টাইপের বার্তা দিয়ে দেয়,[২] তখন শিশুমনগুলো ভেবে বসে—তবে তো বিবর্তনই সত্য; তাদের মনে প্রশ্ন উঠে—তবে কীভাবে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়? তখন যুক্তির ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দেয়ার মতো কেউ থাকে না।

বস্তুত, 'সর্বশ্রেষ্ঠ' আর 'সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' এক জিনিস নয়। আগামী দশ বছর পরের ক্যানন ৫৪৩২১ডি মডেল বের করা মানে এই নয় যে, এখনকার অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ৭০ডি মডেলের কোনো নির্মাতা নেই। এখনকার এই মডেলেই যে-পরিমাণ জ্ঞানবিজ্ঞান আর শ্রম প্রয়োগ করা হয়েছে, তাই যদি এর পেছনে নির্মাতা থাকার নির্দেশ করে, তবে চোখের ওই ছোট্ট কোটরে ক্রমাগত লেন্স আকিয়ে-বাঁকিয়ে এই মুহূর্তে আপনার দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করা, প্রয়োজনে লেন্সক্যাপ (চোখের পাতা) আর লিকুইড দিয়ে চোখকে ক্রমাগত রক্ষা করার মতো কুশলী তো একজন বুদ্ধিমান নকশাকারীর দিকেই ভিড়ায়।

মুমিন অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের জন্য কিন্তু সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ে রবের কথাই যথেষ্ট হয়। আর বাকিরা সত্য পেয়েও কথা পেঁচায়, যেমনটা ডারউইন করেছিল, করছে এখনকার ডারউইনবাদীরা।

> 'শীঘ্রই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, এটা সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?'[৩]

---

[২] অক্টোপাসের চোখ, ডক্টর জাফর ইকবাল। এই সায়েন্স ফিকশনটিতে—মানুষের বিভিন্ন দিক নিখুঁত না, আর এটা বিবর্তনের ধারাতে আরও নিখুঁত হতে পারত—এমন একটা বার্তা দেয়া হয়েছে। যদিও শেষমেশ মানুষের নিজের ডিজাইন করা ত্রুটিবিহীন মানুষে সভ্যতার পরাজয় দেখানো হয়েছে, কিন্তু বিবর্তনবাদ সত্য ধরে নিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনে যা অর্জিত হয়েছে সেটাই ভালো এমন বার্তা থেকেই গেছে। কখনো বার্তা এমন হয়নি যে, সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্তই ভালো।

[৩] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫৩।

তবে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রেও তাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করা হয়। বাসররাতে এমন একটা সময় স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়, যখন স্ত্রী নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরে ক্ষমা করতে বাধ্য হন। নচেৎ সমাজে নতুন স্ত্রী নিয়ে আরও দশ কথা বের হবে। তবে এটা ঠিক যে, স্ত্রী যদি নিজেই স্বামীর প্রতি ইহসান করে ধার্যকৃত মোহর আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়, সেজন্য স্ত্রী অবশ্যই আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদানের আশা করতে পারে শেষ বিচারের দিন। কুরআনে এসব ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা রাখা হয়নি। আল্লাহ কুরআনে কী বলেছেন দেখুন-

> ‘আর আনন্দের সাথে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে যদি তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা সানন্দে তা ভোগ করতে পারো।’[৪৮]

আরেকটি ব্যাপার হলো, কোনো বৈধ কারণে যদি তালাকের সিদ্ধান্ত হয়েই যায়, তবে স্বামীর পক্ষে এটাও উচিৎ নয় যে, তার প্রাক্তন স্ত্রীকে দেওয়া মোহর ফেরত নেবে।

> ‘আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে স্তূপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট যুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে? আর তোমরা তা নেবেই বা কেমন করে, যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।’[৪৯]

আল্লাহ এখানে নারীকে নিজের অবস্থান ধরে রাখার ব্যাপারে যে সাহস দিয়েছেন, আমাদের বেগম রোকেয়ার অনুসারী নারীবাদী নারী কিংবা পুরুষরা এটি কখনো তুলে ধরেন না ইচ্ছাকৃতভাবে। কারণ, বিয়ের এই সুন্দর দিক তুলে ধরলে বন্ধ হয়ে যাবে তাদের লিভ টুগেদারের ক্রমবর্ধমান এবং জনপ্রিয় ব্যাবসা এবং ভ্যালেন্টাইন্স ডে’র রাজনীতি।

আল্লাহ আমাদের নারীবাদের ধ্বংসাত্মক দিক থেকে নিজেদের এবং আমাদের পরের প্রজন্মকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

---

[৪৮] সূরা নিসা, ৪ : ৪।

[৪৯] সূরা নিসা, ৪ : ২০-২১।

নাস্তিকতা, তর্ক, যুক্তি

আসিফ আদনান

১২৪ হিজরির ঈদুল আযহার দিনে কুফার অধিবাসীরা বিচিত্র এক ঘটনার সাক্ষী হয়। কুফায় বানু উমাইয়্যার নিয়োগকৃত প্রতিনিধি, খালিদ ইবনু আবদিল্লাহ আল কাসরী ঈদের খুতবায় ঘোষণা করেন—

> ‘হে লোক সকল, আপনারা কুরবানি করুন। মহান আল্লাহ আপনাদের কুরবানি কবুল করে নিবেন। আমি জা’দ ইবনু দিরহামকে কুরবানি করছি। সে মনে করে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে খলীলরূপে গ্রহণ করেননি এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথাও বলেননি। অথচ জা’দ যা বলছে মহান আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।’

তিনি জা’দ ইবনু দিরহামকে মৃত্যুদণ্ড দেন।[৫০]

জা’দ ইবনু দিরহামের ব্যাপারে ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যের[৫১] সারমর্ম হলো :

জা’দ ইবনু দিরহাম হলো প্রথম ব্যক্তি যে দাবি করেছিল, কুরআন সৃষ্ট। পরবর্তীতে মুতাযিলাদের মাধ্যমে এই কুফরি আকীদা প্রসার পায়। জা’দের কাছ থেকে এই আকীদা গ্রহণ করে জাহমিয়্যাহ ফিরকার সূচনাকারী জাহম বিন সাফওয়ান। জাহম বিন সাফওয়ানের কাছ থেকে এই আকীদা গ্রহণ করে বিশর আল মুরাইসি। আর বিশর আল মুরাইসির কাছ থেকে গ্রহণ করে আহমাদ ইবনু আবি দুআদ।

জা’দ ইবনু দিরহামের আকীদাকে জনপ্রিয় করে জাহম বিন সাফওয়ান। এবং জাহম বিন সাফওয়ানের প্রচারিত আকীদার বিভিন্ন দিক বিভিন্নভাবে মুতাযিলা-সহ ভ্রান্ত

[৫০] খালকে আফআলিল ইবাদ, ২৯; মুখতাসিরুল উলু, ৭৫।

[৫১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/১৪৮।

আকীদার নানা ফিরকার উত্থানে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পবিত্র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বিভিন্ন ভ্রান্তির শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় জাহম বিন সাফওয়ানের কাছে।

জাহম বিন সাফওয়ানের এ বিষাক্ত আকীদা কীভাবে গড়ে উঠেছিল? কোন চিন্তা পদ্ধতির মাধ্যমে সে হাজার বছর ধরে উম্মাহকে তাড়া করে বেড়ানো এ ভ্রান্ত উপসংহারগুলোতে পৌঁছেছিল?

জাহমের পথভ্রষ্টতার শুরুটা হয়েছিল নাস্তিকদের সাথে তর্ক থেকে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম বুখারি-সহ অন্যান্য আরও অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী, সুমানিয়্যাহ নামের একদল দার্শনিকদের সাথে ইসলামের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক শুরু করে। সুমানিয়্যাহরা ছিল ভারত ও খুরাসানের দিকের একটা ফিরকা, যারা বিশ্বাসের দিক থেকে naturalist (প্রকৃতিবাদী/প্রাকৃতদার্শনিক) ছিল।

সুমানিয়্যাহদের সাথে জাহমের তর্কের ভিত্তি ছিল কালাম।[৫২] রেটোরিক, লজিক। এ ধরনের তর্কের একটা উদাহরণ দেখা যাক। সুমানিয়্যাহরা জাহমকে প্রশ্ন করল—

তুমি দাবি করো, ইলাহ আছে?

- হ্যাঁ।

তুমি কি সরাসরি তোমার ইলাহকে দেখেছ?

- না।

তাঁর কথা শুনেছ?

- না।

কোনো ঘ্রাণ পেয়েছ?

- না।

কখনো তাঁকে স্পর্শ করেছ?

- না।

কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছ?

- না।

তার মানে তুমি আসলে জানো না যে, সে ইলাহ?

- ...

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যাকে অনুভব করা যায় না, তার কি আসলেই অস্তিত্ব আছে?

জাহম কোনো জবাব দিতে পারল না। এ কথোপকথনের পর চল্লিশ দিন সে সালাত

[৫২] শারহু কিতাবুল ইবানাহ, ১৮।

আদায় করা থেকে বিরত থাকল। কারণ, সে বুঝতে পারছিল না সে আসলে কোন সত্ত্বার ইবাদাত করছে। তারপর একটা যুতসই উত্তর খুঁজে বের করল। কিন্তু দেখা গেল এ উত্তরকে যুক্তির মাপকাঠিতে টিকিয়ে রাখতে হলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পবিত্র নাম ও গুণাবলীসমূহকে অস্বীকার করতে হচ্ছে। নিজের যুক্তির দার্শনিক ও যৌক্তিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য সে তাই করল। এভাবে সে কুরআন সৃষ্ট হবার বিশ্বাসও গ্রহণ করল, কিংবা বলা যায় করতে বাধ্য হলো।

পুরো ব্যাপারটার শুরু কোথা থেকে?

অনেক আলিমের মতে, জাহম বিন সাফওয়ানের ফিকহের ব্যাপারে জ্ঞান ছিল, এছাড়া ইলমুল কালামেও তার দক্ষতা ছিল। কিন্তু আকীদার মজবুত ভিত্তি, শারীয়াহর দলিল, দলিলের সঠিক ব্যাখ্যা এবং সালাফ আস-সালিহীনের আছারের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া নাস্তিকদের ঠিক করা কাঠামোর ভেতরে ঢুকে তাদের সাথে বিতর্কে যাবার কারণে সে নিজে বিভ্রান্ত হয়েছিল, এবং পরবর্তী যুগ যুগ ধরে তার এসব বিভ্রান্তি উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফিরকা ও ফিতনার জন্ম দিল, যার প্রভাব আজও চলছে। যতটুকু বোঝা যায়, জাহমের প্রাথমিক নিয়তও ভালো ছিল। তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সে ইসলামকে ডিফেন্ড করত, নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দিত। আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু মৌলিক কিছু ভুলের কারণে এ কাজটাই উম্মাহর জন্য মারাত্মক এক ফিতনা হয়ে দেখা দিল।

জাহমিয়্যাহ এবং মুতাযিলাদের সময়ে কাফিরদের সাথে তর্কের মূল বিষয় ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী ইত্যাদি নিয়ে। তাই এ বিতর্ক থেকে জন্ম নেয়া বিচ্যুতিগুলো ছিল মূলত আকীদার এ বিষয়গুলো নিয়ে। আমাদের সময়েও নাস্তিকদের সাথে অনেক তর্ক হয়। বেশ ক'বছর যারা ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করেন তাদের কাছে এটা কাজের বেশ জনপ্রিয় একটা দিকও। আমাদের সময়ের নাস্তিকরাও আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, 'স্রষ্টা এমন না হয়ে অমন না কেন?'– এ ধরনের প্রশ্নও করে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমাদের সময়ে কাফিরদের দ্বন্দ্বের মূল বিষয় আল্লাহর অস্তিত্ব না।

'আল্লাহ আছেন'—অ্যামেরিকা বলেন, ইন্ডিয়া বলেন, চায়না বলেন, ইউএন বলেন—বৈশ্বিক কুফর-ব্যবস্থা এ বিশ্বাস মেনে নিতে রাজি আছে। কিন্তু আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে জীবন চালাতে হবে, সমাজ চালাতে হবে, শাসন চালাতে হবে—এটা মেনে নিতে তারা রাজি না। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামি শারীয়াহ যেসব বিধিবিধান ঠিক করে দেয়, বুঝে-না-বুঝে ভোগবাদের অনুসরণে ব্যস্ত আজকের পৃথিবী সেটা মানতে রাজি না। সামাজিক আচার-আচরণ ইসলামি শারীয়াহ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে, সংস্কৃতি কিংবা ট্র্যাডিশানের ভিত্তিতে না—আজকের সমাজ

এটা মানতে নারাজ। মুসলিমদের সমাজ-ই এটা মানতে চায় না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন দিয়েই শাসন করতে হবে—এ কথাটা কারও পক্ষে আজ মেনে নেয়া সম্ভব না।

তাই আজ দ্বন্দ্বটা 'আল্লাহ আছেন কি না?' সেই প্রশ্ন নিয়ে না। দ্বন্দ্ব হলো 'আল্লাহর শাসনের সীমানা কতদূর?' তা নিয়ে।

আপনি দেখবেন, ইসলামের ঐ বিষয়গুলো নিয়ে কাফিররা সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে, যেগুলো বর্তমান ভোগবাদী, লিবারেল বিশ্বদর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। সেটা হতে পারে নিকাবের আদেশ, স্বামীর আনুগত্য, মহিলাদের ঘরে থাকা, মুরতাদ হত্যার বিধান, কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা, কুফর ও শিরকের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, জিহাদ, আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবমাননাকারীর শাস্তি ইত্যাদি।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়টা হলো, প্রতিনিয়ত একটা সেক্যুলার ও পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরে থাকার কারণে, আমরা মোটামুটি সবাই কাফিরদের এ দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে মূল অবস্থান হিসেবে মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়েছি কাফিরদের ঠিক করা মানবতা, শান্তি, অধিকার ইত্যাদির সংজ্ঞা ও কাঠামোগুলো। তারপর চেষ্টা করছি এ কাঠামোগুলোর ভেতরে ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে খাপ খাওয়াতে। স্বাভাবিকভাবেই যখন পারছি না, তখন আমরা এ বিধানগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করছি।

পুরো ব্যাপারটার সাথে জাহম বিন সাফওয়ানদের অবস্থার অদ্ভুত মিল আছে। জাহমদের প্রথম ভুল ছিল, অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক মূলনীতিগুলোকে মেনে নিয়ে তর্কে ঢোকা। দ্বিতীয় ভুল ছিল, আকীদা, নুসুস ও আছার (text) এর শক্ত জ্ঞান ছাড়াই বিতর্ক করা। তাদের তৃতীয় ভুল ছিল, তর্কে আটকে যাবার পর সেই তর্ক ছেড়ে না দিয়ে তর্কে জেতার জন্য নিজেদের বানানো নতুন নতুন যুক্তি নিয়ে আসা। চতুর্থ ভুল ছিল, সালাফ আস-সালিহীনের অবস্থানের সাথে এসব যুক্তির অসামঞ্জস্য তাদের কাছে তুলে ধরার পর তাওবা না করে নিজেদের ভুলের উপর অটল থাকা। নিজের অহম, আত্মমর্যাদার ভ্রান্তিকর ধারণা, 'মানুষ কী বলবে?' ইত্যাদির কারণে ভুল স্বীকার না করা। আজ হুবহু এ ব্যাপারটাই হচ্ছে।

ইসলামের সঠিক বুঝ ছাড়াই আমরা ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি। সেটা করতে যাচ্ছি কাফিরদের মানবতা, অধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদিকে সঠিক ধরে নিয়ে। তারপর ইসলামকে মানবিক, আধুনিক, সহজ, শান্তিপ্রিয় প্রমাণের জন্য, কাফিরদের কাছে নিজেদের 'সভ্য' আর 'অ-সন্ত্রাসী' প্রমাণের জন্য এমনভাবে কুরআন ও হাদীসকে ব্যাখ্যা করছি, যেসব ব্যাখ্যা পুরোপুরি বাতিল। আর যখন ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়া

হচ্ছে, তখন আমরা ভুল স্বীকার করছি না। বরং নিজেরা আবোল-তাবোল ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

দুটো পথ—প্রায় হুবহু এক। যদিও মাত্রার ভিন্নতা আছে। দেখুন, জাহমিয়্যাহ ও মুতাযিলাদের অনেকের প্রাথমিক নিয়ত ভালো ছিল; কিংবা বলা যায়, আন্তরিক ছিল। এটা আহলুস সুন্নাহর অনেকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আন্তরিক হওয়া এবং ভালো নিয়ত থাকা যথেষ্ট না। বিশেষ করে, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে। শারীয়াহর বিধান, হাদীসের বক্তব্য কিংবা কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করা কোনো "যেমন খুশি করো" প্রজেক্ট না, যেটা আমরা সবাই ইচ্ছেমতো করতে পারব। প্রায় প্রত্যেকটা বাতিল ফিরকা কোনো-না-কোনো আন্তরিক লোকের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। এ বিষয়গুলোর মধ্যে এমন অনেক অর্থ ও তাৎপর্যের এমন অনেক পর্যায় আছে, যার সবকিছু হয়তো আমাদের কাছে পরিষ্কার না। আল্লাহর সব হুকুমের পেছনের হিকমাহ আমরা জানব বা আমাদের জানাতে হবে—এমন কোনোকিছু ইসলাম বলে না। এবং এসব বিষয়ে সূক্ষ্ম কোনো ভুলও এক সময় ভয়ঙ্কর বিচ্যুতিতে পরিণত হতে পারে। কারণ, ইবলিস অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে আপনার-আমার চেয়ে অনেক আগানো। আমাদের দুর্বলতা কোথায়, আমাদের মনের অসুখগুলো কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, সেটা সে খুব ভালোভাবেই জানে।

কয়েকটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ :

১. আকীদা ও শারীয়াহর বিধিবিধানের ব্যাপারে বুঝ ও দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র সালাফ আস-সালিহীন ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইমামগণের কাছ থেকে নেওয়া।

২. তর্কে জেতার চেয়ে আকীদা ও দ্বীন হিফাযত করা লক্ষ কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দেয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ভুল ব্যাখ্যার হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করা।

৩. ইসলামকে বুঝতে হবে দলিলের ভিত্তিতে। যুক্তি, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়ানুভূতি—সবকিছু ওহির অনুগামী হবে, উলটোটা না। আল্লাহ ও রাসূল ﷺ যা বলেছেন, তা-ই সঠিক। কোনো যুক্তি ছাড়া, কোনো প্রমাণ ছাড়া। যদি আমার চোখ, কান বা আকল (বুদ্ধি/যুক্তি) এক কথার সাক্ষ্য দেয়, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ উলটোটা বলেন, তাহলে আমার চোখ, আমার কান, আমার আকল মিথ্যা বলছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য বলছেন—এটা বিশ্বাস করতে হবে। আসলেই বিশ্বাস করতে হবে।